Vol. 49 | No. 2 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের আঙ্গিক

Volume	49
Issue	2
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Qudrat-E-Huda
Published online	March 1, 2025
DOI	10.62328/sp.v49i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i2.8
Pages	১৪১-১৫৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৪৯, সংখ্যা : ২ ॥ ফাল্গুন ১৪১৮ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০১২

শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের আঙ্গিক

Check for updates

মোহাম্মদ কুদরত-ই-হুদা*

বাংলাদেশের উপন্যাসের ইতিহাসে শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) এক অনন্য নাম। তিনি বাংলাদেশের উপন্যাসকে কেবল বিষয়ের বৈচিত্র্যে ঋদ্ধ করেননি, আঙ্গিক-নিরীক্ষায়ও সমৃদ্ধ করেছেন। শুধু বিষয় এবং আঙ্গিকের বৈচিত্র্য নয়, শওকত ওসমানের উপন্যাসচর্চার ইতিহাস বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের নানা উত্থান-পতন, গঠন-পুনর্গঠনের ইতিহাসের সমান্তরাল। এ-কারণে বলা যায়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির এক বিশ্বস্ত দলিল শওকত ওসমানের উপন্যাস। শওকত ওসমানের উপন্যাসচর্চা শুরু হয় গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে [*বনী আদম* (১৯৪৬) এবং *জননী* (১৯৫৮)] বৃহত্তর জীবনের রস-রহস্য উন্মীলনের মধ্য দিয়ে। শওকত ওসমান জন্মগ্রহণ করেছিলেন পশ্চিম বাংলায়। তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে পশ্চিম বাংলার গ্রামীণ-জীবন। যদিও বাংলাদেশকে তিনি স্বদেশ হিসেবে অর্জন করেছিলেন, তবু প্রগতিশীল স্বদেশপ্রাণ মন-মনস্বিতার কারণে অর্জিত স্বদেশের পরিবর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকের অভিমুখও বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, ষাটের দশকে বাংলাদেশ যখন রাজনৈতিক, শৈল্পিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবরুদ্ধতার মধ্যে নিপতিত তখন শওকত ওসমান রচনা করলেন আইয়ুবি স্বৈরাচারবিরোধী নতুন বিষয় এবং রূপক-ফ্যান্টাসিধর্মী নতুন আঙ্গিকের চারটি উপন্যাস — *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২), *চৌরসন্ধি* (১৯৬৬), *সমাগম* (১৯৬৮) এবং *রাজা উপাখ্যান* (১৯৭০) । কিন্তু ১৯৭১ সালে স্বদেশে পাক-হানাদার বাহিনীর আক্রমণ ও নির্যাতন যখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, তখন সংগত কারণেই শওকত ওসমান উপন্যাসের বিষয় হিসেবে বেছে নেন মুক্তিযুদ্ধকে। ফলে স্বভাবতই উপন্যাসের শরীর থেকে সরে যায় রূপক-ফ্যান্টসির আবরণ এবং সত্তর দশকেই শুধু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি রচনা করেন চারটি উপন্যাস — *জাহান্নম হইতে বিদায়* (১৯৭১), *দুই সৈনিক* (১৯৭৩), *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৭৩) এবং *জলাংগী* (১৯৭৪)। আবার আশির দশকে দেশ যখন স্বদেশী স্বৈরাচার দ্বারা অবরুদ্ধ তখন তিনি যূথবদ্ধ মানুষের প্রতিরোধ-প্রত্যাশী বিষয়বস্তু নিয়ে রূপকাঙ্গিকে রচনা করলেন *পতঙ্গ পিঞ্জর* (১৯৮৫)-এর মতো উপন্যাস। শওকত ওসমানের উপন্যাসের তিনটি পর্বের আঙ্গিকের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি পর্বেরই রয়েছে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। যেমন, প্রথম পর্বের গ্রামীণ-জীবন-নির্ভর উপন্যাসের ক্যানভাস বিস্তৃত, ভাষা বিস্তৃত বিবরণধর্মী, চরিত্রায়ণ বাস্তববাদী, পরিচর্যা বর্ণনাত্মক, এবং সময়ও বিস্তৃত। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসের ক্যানভাস ক্ষুদ্র, ভাষা ইঙ্গিতময়, চরিত্রায়ণ প্রতীকাশ্রয়ী, পরিচর্যা নাটকীয়। আর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের ক্যানভাস ক্ষুদ্র হলেও প্রতিনিধিত্বের মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল, ভাষা কোথাও ত্রস্ত, অস্থির, কোথাও শানিত প্রতিক্রিয়ায় বিষময়, আবার কোথাও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আধার; চরিত্রায়ণ প্রতিনিধিত্বমূলক, কৃত্রিমতাবর্জিত,

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ।

পরিচর্যা মূলত চিত্রাত্মক। প্রকৃতপক্ষে, শওকত ওসমানের উপন্যাসের আঙ্গিকের পালাবদল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাসের সঙ্গে জৈবিকভাবে সংশ্লিষ্ট।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে গৌরবময় ঐতিহাসিক ঘটনা। এটি কেবল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অর্জনের কারণে তাৎপর্যপূর্ণ তা নয়, বরং এটি একটি জনগোষ্ঠীর সত্তার আবিষ্কার এবং সত্তার নির্মাণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭০ সালের নির্বাচন পর্যন্ত নানা আন্দোলন-সংগ্রাম পূর্ববাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিসত্তার আকাঙ্ক্ষার যে অস্পষ্ট রূপাবয়ব তৈরি করেছিল, তা-ই ১৯৭১ সালে স্পষ্টতা পায়। নতুন পরিস্থিতিতে বাঙালির অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ একটি স্পষ্ট আদল বা রূপরেখায় ধরা পড়ে। বাঙালির মধ্যে জন্ম নেয় শোষণহীন, উদার-গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, একই সঙ্গে বিপ্লবের স্পন্দনে স্পন্দিত এক রাষ্ট্রের বাসনা। এই নতুন রাষ্ট্রের বাসনা স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কতটা পূরণ হয়েছে সেটি ভিন্ন বিতর্ক, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে যে জনগণীয় বাসনা তৈরি হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। '১৯৭১ সালের যুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের ব্যাপক অংশ অস্ত্র হাতে নিয়েছিল। তাদের মনে নতুন যুগের স্বাভাবিক আশা জেগেছিল' (সলিমুল্লাহ ২০০৭ : ৭৪)। এই 'নতুন যুগের আশা' এবং নবতর রাষ্ট্রীয় বাসনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। যুদ্ধ-পরবর্তী রাষ্ট্রের রূপরেখা যে-ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার অনন্যতা অনস্বীকার্য। ফলে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ কেবল ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মদান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা, নারীর সম্ভ্রমহানির নির্মম আলেখ্য নয়, তারও অতিরিক্ত কিছু। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য, আদর্শ, ব্যাপ্তি-ব্যাপকতা, গভীরতা, ধ্বংস, সৃজন — এসব কেবল মহাকাব্যের আয়োজনের সঙ্গেই তুলনীয়। আহমদ ছফা যথার্থই বলেছেন—

> ইতিহাসে কোন কোন সময় আসে যখন এক একটা মিনিটের ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং ঘনত্ব হাজার বছরকে ছাড়িয়ে যায়। আমাদের জীবনে একাত্তর সাল সে রকম।...কারণ একাত্তর সালে যা কিছু ঘটেছে, আমি যা কিছু দেখেছি...আমার জাতির যে জাগরণ, যে প্রতিরোধ, যে দৃঢ় সংকল্প; মৃত্যুর যে সরল প্রস্তুতি, জয়ের যে নেশা, যে আত্মত্যাগ, যে বোকামি এবং উন্মাদনা আমি দেখেছি — সবকিছুকে একটা বিরাট সত্তার অবিভাজ্য অংশ মনে হয়। চোখ বুঁজে একাত্তরের কথা চিন্তা করলে আমার কানে মহাসিন্ধুর কল্লোল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে (আহমদ ২০০৭ : ২৫)।

বাঙালি জাতিসত্তার এই ইতিহাস সমকালীন এবং উত্তরকালীন সৃষ্টিশীল সত্তাকে আলোড়িত এবং দায়বদ্ধ করবে — এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ কোনো শিল্পিসত্তাই দেশ-কাল-ইতিহাসনিরপেক্ষ নয়। সংগত কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও এদেশের শিল্পের সবগুলো শাখার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। উপন্যাসশিল্পেও মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব-প্রেরণা নিতান্ত কম নয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে অদ্যাবধি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস লিখিত হয়েই চলেছে। সমকালচেতনা এবং ইতিহাসসচেতনতা শওকত ওসমানের মজ্জাগত। যতীন সরকার শওকত ওসমানের ইতিহাসচেতনা সম্পর্কে বলেছেন—

> শওকত ওসমান অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই জাতিকে অসুস্থ ও পশ্চাৎগামী বিকৃত ইতিহাস থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। স্বজাতির মানুষগুলোর মধ্যে সুস্থ ইতিহাসবোধ সঞ্চার করাই তাঁর লেখনী চালনার অন্যতম উদ্দেশ্য (যতীন ১৯৯১ : ৮)।

এই ইতিহাসচেতনা থেকেই শওকত ওসমান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ভিত্তি করে রচনা করেছেন চারটি উপন্যাস। শওকত ওসমানের মোট উপন্যাসের সংখ্যা পনের। সেই হিসেবে তাঁর উপন্যাসসংখ্যার এক চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। সুতরাং এটি সহজেই অনুমেয় যে, শওকত ওসমানের শিল্পিসত্তায় মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব কত প্রবল ছিল।

শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস চারটি হচ্ছে *জাহান্নম হইতে বিদায়*, *নেকড়ে অরণ্য*, *দুই সৈনিক* এবং *জলাংগী*। প্রত্যেকটি উপন্যাসই আকারে ছোট এবং প্রকরণে প্রায় সমধর্মী। এসব উপন্যাসের আঙ্গিক বিবেচনার পূর্বে বাংলাদেশে রচিত মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত উপন্যাস সম্পর্কে এবং শওকত ওসমানের এই উপন্যাস চতুষ্টয় সম্পর্কে সমালোচকদের কিছু মত তুলে ধরা হলো। এসব মত শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের আঙ্গিকের আলোচনার জন্য সহায়ক এবং প্রাসঙ্গিক হবে বলে আমাদের ধারণা—

> (ক) বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে অথচ এই সংগ্রামের অভিজ্ঞতা তিরিশ বছরেও কোন মহৎ সাহিত্যের জন্ম দেয় নাই। এই ধরনের নালিশ সর্বৈব ভিত্তিহীন এমন কথা বলার সাহস আমার নাই (সলিমুল্লাহ ২০০৭ : ১৬৮)।
>
> (খ) যুদ্ধরত সমগ্র জাতিসত্তার প্রাণস্পন্দনকে শিল্পমণ্ডিত করতে গেলে যে গভীর জীবনাসক্তি এবং শৈল্পিক নিরাসক্তি প্রয়োজন, কতিপয় ব্যতিক্রম বাদে আমাদের উপন্যাসে সেই অনিবার্য সমন্বয় তেমন লক্ষ করা যায় না (রফিকউল্লাহ ১৯৯৭ : ৩১২)।
>
> (গ) আসলে বাঙালি জাতির জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে মহাকাব্যোচিত সার্বিক ও যথাযথ উপন্যাস রচনার কাজে কোন কথাশিল্পী এখনো এগিয়ে আসার সাহস করেন নি, যেখানে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনাবলির যথার্থ সমাদর করা হবে (সৌমিত্র ২০০৬ : ২৮)।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ সম্পর্কিত উপর্যুক্ত মন্তব্যগুলো দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মোটামুটিভাবে সত্য। কারণ, যে মহত্তর জীবনচেতনা এবং রাষ্ট্রচেতনাকে সামনে রেখে একটি দীর্ঘ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলোতে সত্যিই অনুপস্থিত থেকে গিয়েছে। এই দায়ভার থেকে শওকত ওসমানও দূরে নন। শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস চারটি সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত নিচে তুলে ধরা হলো —

> (ক) আমাদের কথাসাহিত্যিকেরা মুক্তিযুদ্ধকে অনেকটা বলাৎকারের উপাখ্যানে পরিণত করেছেন।...'নেকড়ে অরণ্য' ও 'দুই সৈনিক'-এও তাই হয়েছে (হুমায়ুন ২০০৯ : ৭০)।
>
> (খ) যে ব্যাপক, গভীর ও সমগ্রতাস্পর্শী জীবন-অনুধ্যান উপন্যাসনির্মিতির মৌল শর্ত, মুক্তিযুদ্ধ-আশ্রয়ী উপন্যাসে শওকত ওসমান সে শর্ত পূরণে অনেকটা দ্বিধান্বিত (রফিকউল্লাহ ১৯৯৭ : ৩১৩)।

(গ) বাঙালী জাতিসত্তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের অসামান্য দিক মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এ অবধি যে ক'টি উপন্যাস রচিত হয়েছে তার সব ক'টিই পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক বিশালতা পায়নি। বরং খণ্ড খণ্ড উপাখ্যানের চিত্রণ হিসেবেই তা মূল্যায়িত হতে পারে। 'জলাংগী'ও এই মন্তব্যের অঙ্গীভূত (ফিরোজ ১৯৯১ : ১০০)।

শওকত ওসমান নিজে এসব 'নিন্দার কথা' এবং তাঁর 'সুরের অপূর্ণতার' কথা অকপটে মেনে নিয়েছেন। শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যাটি এখানে প্রণিধানযোগ্য—

আবেগের তোড়ে নয়, তখন এইভাবে ভেবেছিলাম যে, সিরিজ করে আমাদের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে ধরা। কিন্তু দেখলাম এইভাবে হবে না, অন্যভাবে এটাকে করতে হবে এবং বিরাট ক্যানভাস নিয়েই সেটা সম্ভব। এগুলো যা করেছি সেগুলো খামচি, বাস্তবকে খামচি দেয়া বলতে পার। এসব রচনা করে আমি নিজেই খুব অতৃপ্ত মনে করছিলাম। ভেবেছিলাম পরে বড় করে উপন্যাস লিখব। অনেক সময় যেসব ঘটনা নিজের সামনে দিয়ে যায়, ঠিক ধরা হয় না আর কি, সে জন্যেই এসব চেষ্টা, এগুলো ধরে রাখার জন্যে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা তো বিরাট ব্যাপার।...আসলে এই বিরাট ব্যাপারে নানা পেশা ও শ্রেণির মানুষের ইনভলবমেন্টটাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে তা খণ্ড চিত্র হতে বাধ্য। আমাদের গুলো (আমেরিকার সিভিল ওয়ার নিয়ে লেখা *গন উইথ দ্য উইন্ড*, ফ্রান্স ও জার্মানির লড়াই নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলো, *ওয়ার এন্ড পিস* ইত্যাদি উপন্যাসের তুলনায়) খণ্ডচিত্রই—ছোট উপন্যাস বা উপন্যাসিকা বলতে পারি (সৌমিত্র ২০০৮ : ১৭-১৮)।

উপর্যুক্ত আলোচনা-সমালোচনার প্রত্যেকটিই শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের বিষয়সম্পর্কিত। কিন্তু শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস-চতুষ্টয়ের আঙ্গিক আলোচনার জন্য উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, উপন্যাসের বিষয় এবং আঙ্গিক বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আঙ্গিক হচ্ছে বিষয়কে ধারণ করার জন্য বিষয়ের ছাঁচে মাপা আধারেরই নামান্তর।

এক

জাহান্নম হইতে বিদায় (১৯৭১) উপন্যাসটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কলকাতায় বসে লেখা। ১৯৭১ সালের *দেশ* পত্রিকার পূজা সংখ্যায় উপন্যাসটি ছাপা হয়। একই বছর নভেম্বর মাসে উপন্যাসটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি ঢাকা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। *জাহান্নম হইতে বিদায়* উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত গড়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে।

জাহান্নম হইতে বিদায় উপন্যাসের কাহিনি সম্পর্কে বলা হয়েছে (শহীদ ২০১০) — 'উপন্যাসের কাহিনির কোন উত্থান-পতন নেই'। ধারাবাহিক কোনো ঘটনাও নেই *জাহান্নম হইতে বিদায়* উপন্যাসটিতে। প্রধান চরিত্র গাজী রহমানের চোখে দেখা এবং কানে শোনা ঘটনা-বিবরণই উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করেছে এবং কাহিনিকে এগিয়ে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসে প্রথাগত অর্থে কোনো নিটোল কাহিনিবৃত্ত নেই। কারণ, এতে কোনো ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জীবনের আলেখ্য নেই, আছে পঞ্চাশের বেশি বয়সী একটি জীবনের মাত্র

দেড় মাসের অভিজ্ঞতা, সংকট, ভাবনা, বেদনা, উত্তরণ ইত্যাদির বিবরণ। অন্য কথায় বলা যায়, *জাহান্নম হইতে বিদায়* হচ্ছে একজন মানুষের জীবনের দেড় মাসের কিছু টুকরো ঘটনার উপস্থাপন। সেই বিচারে *জাহান্নম হইতে বিদায়* ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত বলে মনে হতে পারে। কারণ, জীবনের মহাসিন্ধু সময় থেকে বিন্দুতুল্য দেড় মাসকে বেছে নেয়া হয়েছে। আবার একটি মানুষের পূর্ণায়ত জীবন নানা অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞান, ঘটনা-দুর্ঘটনা, বহুমাত্রিক সম্পর্কের জাল এবং তার টানাপোড়েন, ঊর্ধ্বগতি-অধোগতি নানা কিছুতে ভরা থাকে। পূর্ণায়ত জীবনের বৃন্তে পুষ্প যেমন ফোটে, কীটও তেমনি বাসা বাঁধে। জীবন প্রকৃতপক্ষে আলো-আঁধারির রহস্যে ঘেরা এক মিশ্র প্রপঞ্চ। কিন্তু *জাহান্নম হইতে বিদায়* উপন্যাসে সেই পূর্ণায়ত জীবন এবং তার রূপায়ণ নেই, আছে খণ্ডজীবন। এদিক বিচারে *জাহান্নম হইতে বিদায়* মহৎ এবং পরিপূর্ণ উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত কি না সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু গ্রন্থটির বর্ণনার ভাষাভঙ্গি, বিধৃত বিষয়ের ব্যাপ্তি, জাতিগত সংকটের বিস্তৃত ক্যানভাস, বহুমানুষের কণ্ঠস্বর, কোলাহল ইত্যাদি গ্রন্থটিকে উপন্যাসের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

উপন্যাসের কাহিনির মহৎ পরিণতিহীনতা, একক বা একাধিক চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণহীনতা, সময়ের বিস্তৃত ক্যানভাসহীনতা, শৈল্পিক সংযমহীনতা ইত্যাদি মহৎ জীবনদর্শনের অভাব উপন্যাসটিতে রয়েছে — এ কথা সর্ববাদী সত্য। কিন্তু এ-বিষয়গুলো অনুসন্ধানের পূর্বে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, উপন্যাসটি বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের এক সংকটকালীন মুহূর্তকে ধরতে চেয়েছে। এই সংকটের স্বরূপ, ব্যাপ্তি এবং গভীরতা বিশ্লেষণ করলে উপন্যাসের দেড় মাস সময়ব্যাপ্তি প্রকৃতপক্ষে দেড় মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কারণ 'ইতিহাসে কোন কোন সময় আসে যখন এক একটা মিনিটের ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং ঘনত্ব হাজার বছরকেও ছাড়িয়ে যায়। আমাদের জীবনে একাত্তর সাল সে রকম' (আহমদ ছফা ২০০৭ : ২৫)। উপন্যাসে প্রকৃতপক্ষে গাজী রহমানের সংকট আর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংকট অভিন্ন হয়ে ওঠায় উপন্যাসের দেড় মাস সময়ের ব্যাপ্তি কোনো সীমাবদ্ধতা না হয়ে বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত প্রকৃতপক্ষে একটি জাতির জাতীয় চিন্তার ধারাবাহিকতা, জীবনযাপনের ধারাবাহিকতা, সময়ের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে দিয়েছিল। তাই *জাহান্নম হইতে বিদায়* উপন্যাসের চরিত্রায়ণের প্রশ্নে তেমন কোনো ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। কোনো চরিত্রই পূর্ণ বিকশিত হয়নি। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর থেকে দীর্ঘ দেড় মাস বাংলাদেশের উপর দিয়ে নিষ্ঠুরতার যে তাণ্ডব বয়ে গেছে, বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে যে আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে, তা গাজী রহমানসহ সব চরিত্রেরই জীবনে দুঃস্বপ্নের মতো বিরাজ করেছে। ফলে উপন্যাসে আমরা দেখি গাজী রহমান চরিত্রের চিন্তার মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই।

'তার চিন্তাজগতে যুক্তির সমস্ত জাল ছিন্ন হয়ে গেছে' (শিরিন ১৯৯৩ : ১০৪)। তার 'নাওয়া-খাওয়া-ঘুম-বিশ্রাম, এক অস্থির উত্তেজনায় সন্ত্রস্ত'। গাজী রহমান ঘুমাতে পারে না দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে। গাজী রহমান যেন যুদ্ধাক্রান্ত বাংলাদেশের প্রতীক হয়ে উঠেছে। অস্থির-

উত্তেজনার কারণে গাজী রহমানের কাছে চিন্তা এবং সময় তার ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে তার মনোজগতে একই সময়ের বৃন্তে একাধিক চিন্তাস্রোত কাজ করেছে। এভাবে উপন্যাসের শিল্পরূপের সঙ্গে চেতনাপ্রবাহরীতি (stream of consciousness) অঙ্গীকৃত হয়েছে। এ কারণে উপন্যাসে কোনো নিটোল তথাকথিত প্লট-পরিকাঠামো গড়ে উঠতে পারেনি। ঔপন্যাসিক গাজী রহমানকে বর্তমান সময়ের ওপর দাঁড় করিয়ে, তার চিন্তাস্রোতকে কখনো চারিয়ে দিয়েছেন অতীতের একাধিক স্মরণের মধ্যে, কখনো আবার টেনে এনেছেন বর্তমানের একাধিক বাস্তবতার মধ্যে, কখনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় তাকে উদ্বেলিত করেছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্রের চিন্তাস্রোতে এই অস্থিরতা এবং ঘন-ঘন গতিপথ বদলানোর কারণে উপন্যাসের ভাষা এবং বর্ণনা অনেক স্থানে অস্থির হয়ে পড়েছে। সৈয়দ আলির সঙ্গে বাসে করে বর্ডারের দিকে যাওয়ার সময় বাসে বসে গাজী রহমানের ভাবনার একটি উদাহরণ—

> গৃহনীড় থেকে বেরিয়ে আসার কথা কত বছর ধরে কতবার না গাজী রহমান ভেবেছে! আজ এমন সুযোগের মুখে সে গৃহগতপ্রাণ, যদিও সচেতনভাবে নয়। কিন্তু নিজের বোধের ওপর দাগাবাজি অসম্ভব। যতই নিঃসাড়তায় মন ছেঁয়ে যাক, ভাবমূর্তির জুলুম নিরবচ্ছিন্ন, একটানা।...উঠানের একটা ফুলগাছ তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিছু বলার উদ্দেশ্যে। গাছ নয় একদম মানুষ। পাপড়ির উপর সন্তানেরা বসে আছে, যখন প্রতিবেশী কণ্ঠ তাদের ডাক দিচ্ছে এক পার্টির আয়োজন সম্পন্ন করতে। লন, গান, ভাঙা দেওয়াল, কয়েকটা বেওয়ারিশ কুকুর, স্টার্টবিমুখ মটোরের কুন্থন-আওয়াজ, পুলিশের হুইসেল, বিদেশি রেকর্ডে 'আভামারিয়ার' একটানা সুরেলা ধ্বনি, পিণ্ডিশাহী ধ্বংস হোক, স্লোগানে বিধ্বস্ত মানচিত্র। এই নরক থেকে আমি মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি...মাঁই বেকসুর হুঁ...আমি নিরপরাধ, শুনে রাখো বেজন্মা বজ্জাতের দল...একদল হিজ্‌ড়ে সঙ্গিনের সামনে করজোড় প্রার্থনারত...খামোখা বিবেকের লড়াই...গাজী আবার বাসের জানালার শিক অজান্তেই চেপে ধরেছিল। কেবলমাত্র মূক থাকার জন্যেই কি তার এত স্বরসাধনা? (শওকত ২০০১, ২ : ২৪০)।

উদ্ধৃতাংশের ভাষা যেন দুঃস্বপ্নতাড়িত, অস্থির-উত্তেজনায় সন্ত্রস্ত, এলোমেলো ভাবনার ধারক, একাত্তরের আক্রান্ত বাংলাদেশের মতোই। ভাষাভঙ্গির এই অস্থির, এলোমেলো উত্তেজনাপূর্ণ, গতিময় রূপটি আরো লক্ষ করা যায় ধ্বংসের অথবা যুদ্ধের যেকোনো দৃশ্য বর্ণনার সময়। যেমন, আলমের বর্ণনায় পনের জন আর্মি মোকাবিলার একটি দৃশ্য—

> রাইফেলের গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল তখনই। জনতার ঘূর্ণিতোড় কিন্তু মন্দীভূত হয় না। চারদিক থেকে গ্রামবাসীর হামলা। তাই সৈন্যরা এদিক-ওদিক রাইফেলের নল ঘোরাতে বাধ্য। গুলির আঘাতে কয়েকজন ধরাশায়ী, কয়েকজন আহত হামাগুড়ি দিয়ে এই ভিড় থেকে একপাশে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।...মাঝপাড়ার মজিদ দরজির উরুর ওপর গুলি লেগেছিল। গুরুতর যখম। তাকে সাহায্য করতে গেলে সে খেঁকিয়ে উঠল, "ভাইসব,...যে-যার কামে যান, আমার দিকে নজর দেবেন না, খোদার কসম। যে-যার কামে যান (শওকত ২০০১, ২ : ২৫০)।

আলমের মুখ এবং ভাষা থেকে ঔপন্যাসিক নিজে ঘটনাটি বর্ণনার দায়িত্ব নিয়ে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তা সত্ত্বেও ভাষার মধ্যে গতি এবং লড়াইয়ের অস্থিরতা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। আবার উপন্যাসের ভাষা কোথাও কোথাও বাংলার স্থবির নিবিড় প্রকৃতি এবং

খালবিলের মতোই শান্ত, অন্তর্গতভাবে কাব্যময় এবং সংস্কৃতবহুল শব্দের বুননে ক্লাসিক গাম্ভীর্যে বিশিষ্ট। গাজী রহমান যখন পাকিস্তানি সেনা দ্বারা অনাক্রান্ত গ্রাম এলাকা দিয়ে অতিক্রম করেছে, তখনকার ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যে দেখা দিয়েছে। যেমন—

> ঝোপঝাড়, কলমিলতা বোঝাই ছিপছিপে জলো মাঠ, সরু আলপথ, রক্তদর্শী ভাঙা শামুকের খোসা, হাঁটু পানিতে ঝপঝপ পা ফেলার শব্দ, আঘাটার অনুৎসাহ, নড়বড়ে সাঁকোর ধ্বনিহীন সম্বোধন, জলঢোঁড়ার পিঙ্গল সতর্কতা, হঠাৎ হঠাৎ পানকৌড়ির উড়াল ও শিশুসুলভ পালাক্রমিক ডোবা-ভাসা, শাপলার রগরগে ইঙ্গিত — এমন লীলাপট তো নিরন্তর ঋতু-বদলের সাক্ষী, পর্যটকের শ্রান্তিহর নয়নাশ্রয় (শওকত ২০০১, ২ : ২৪৫)।

উদ্ধৃতাংশে ভাষার এই গজগমন ভঙ্গি বাংলার প্রকৃতি এবং গাজী রহমানের শ্রান্ত মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। কিন্তু *জাহান্নম হইতে বিদায়* উপন্যাসের ভাষা এর বিষয়ের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে যুক্ত থেকে উপন্যাসের আঙ্গিক পরিগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জাহান্নম হইতে বিদায় উপন্যাসটি যেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালের এক তথ্যচিত্র। গাজী রহমান যেন সেই তথ্যচিত্রের ধারাভাষ্যকার। গাজী রহমান ইউসুফের বাড়ি থেকে নৌযাত্রা করে গিয়ে উঠেছে আলি রেজার বাড়িতে। পথিমধ্যে ক্যামেরা যেন নদীতীরবর্তী ভূখণ্ডের নানা ধ্বংসচিত্রকে ধারণ করেছে। আর নদীপথে দেখা হওয়া নারী এবং তার সন্তান, স্বামী এবং বাবার নিহত হওয়ার ঘটনার বিবরণ যেন গাজী রহমানের নিকট সাক্ষাৎকার আকারে বলেছে। এছাড়া বর্ডারের উদ্দেশে যাওয়ার সময় বিল পার হওয়ার আগে আলম উপন্যাসের আরেক কথক হিসেবে দেখা দিয়েছে। এছাড়া নরসিংদী থেকে নবীনগর যাওয়ার পথে নৌকায় আরেক বৃদ্ধ উপন্যাসের আরেক কথক হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই তিন কথক তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনার মধ্য দিয়ে হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের স্বরূপ যেমন তুলে ধরেছে, তেমনি কাহিনিকে গতিশীল এবং বাস্তবানুগ করে তুলেছে। এসব কথকরূপী সাক্ষাৎকারপ্রদায়কদের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা এবং গাজী রহমান তথা ঔপন্যাসিকের নিজস্ব টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা মিলেই *জাহান্নম হইতে বিদায়*-এর প্লট পরিগঠিত হয়েছে। সব মিলিয়ে যেন তৈরি হয়েছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র। এই তথ্যচিত্রধর্মিতার কারণে উপন্যাসে গভীরতর কোনো জীবনবোধ থিতু এবং প্রকাশিত হয়নি। একই কারণে উপন্যাসে পরিচর্যা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বর্ণনাত্মক এবং চিত্রাত্মক রীতি। আর কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে সিনেমার দৃশ্যায়ন পদ্ধতি।

দুই

দুই সৈনিক (১৯৭৩) উপন্যাসটি শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে আঙ্গিক এবং আয়োজনের দিক থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র মেজাজের। উপন্যাসটি ১৯৭৩ সালের স্বাধীনতা দিবসে প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে স্বল্প পরিসরে এবং নিটোল কাহিনিবিন্যাসে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে এদেশীয় পাকিস্তানবাদীদের সম্পর্কের একটি বিশেষ রূপ এবং হানাদার বাহিনীর নারীলোলুপ মানসিকতার স্বরূপকে উন্মোচন করেছেন ঔপন্যাসিক। শওকত ওসমানের ব্যক্তিগত ক্রোধ এখানে কিছুটা শিল্পে থিতু হয়েছে বলে

মনে হয়। *জাহান্নম হইতে বিদায়* উপন্যাসের 'অশৈল্পিক' মনোভঙ্গি থেকে তিনি এখানে কিছুটা বের হয়ে এসে শিল্পের সড়কে পা রেখেছেন বলে মনে হয়। ভাষা, চরিত্রায়ণ, কাহিনির বিন্যাস, পরিণতি ইত্যাদির প্রশ্নে শওকত ওসমান *দুই সৈনিক* উপন্যাসে অধিকতর যত্নবান এবং সতর্ক। এই উপন্যাসটিতেই প্রথম শওকত ওসমান প্রতিক্রিয়াশীলতাকে অতিক্রম করে স্থানে স্থানে ব্যঙ্গাত্মক হয়ে উঠেছেন। ফলে উপন্যাসটির ভাষাও শওকত ওসমানের অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে লক্ষ্যযোগ্যভাবে ভিন্নতা অর্জন করেছে।

দুই সৈনিক উপন্যাসের কাহিনি সরল এবং দ্রুত পরিণতির দিকে ধাবিত। উল্লেখযোগ্য কোনো উপকাহিনিকে অঙ্গে না ধরে এবং কোনো প্রকার ডান-বাম, উপর-নিচ না করেই এর কাহিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। কেবল মাঝেমধ্যে কখনো স্মৃতিচারণসূত্রে, কখনো বর্তমানের বর্ণনাসূত্রে কয়েকবার কয়েকটি Flash back-এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন—

> আগে সরকারি চাকরি করতেন (মখদুম মৃধার ফুফাতো ভাই) তিরিশ বছর আগে যখন মুসলিম লীগের জোয়ার আসে। ...সিভিল সাপ্লাইজের অফিসার। ফলে, দু-হাতে রোজগারের মৌকা আল্লাতালা মুসলমান অফিসারদের দিয়েছিলেন। গদি মুসলিম লীগের। সুতরাং কোন অসুবিধা হয়নি (প্রাগুক্ত : ২৭৩)।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে অতীতগমনের ঘটনা যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি মুসলিম লীগের চারিত্র্যস্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টাও অস্পষ্ট নয়। এভাবে বর্তমানের প্রয়োজনে দু-একটি অতীত ঘটনার বর্ণনা ছাড়া, উপন্যাসটির কাহিনি বর্ণনায় এবং উপস্থাপনে প্রবল একমুখিতা এবং একক লক্ষ্যপ্রবণতা উপন্যাসটিকে নির্ভার এবং নির্মেদ করেছে। উপন্যাসের কাহিনির স্থানিক পট মোটামুটিভাবে একটি গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঘটনার বৃহত্তর পটভূমি যেন অন্তর্হিত। কাহিনি আগে-পরের কোনো দায়ভার না নিয়ে যেন শুধু একটি ঘটনাকে ঠোঁটে করে সামনে উড়াল দিয়েছে। তবে কোথাও কোথাও রাজনীতির অতীত ইতিহাস চকিতে কাহিনির মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারলেও তা ঔপন্যাসিকের বিস্তৃত মনোযোগ পায়নি। যেমন, মখদুম মৃধার মায়ের স্মৃতিসূত্রে দেশ-বিভাগ-পরবর্তী একটি পরিস্থিতি উঁকি দিয়েছে এভাবে—

> বু-জান পাকিস্তান আইল। কতো মারামারি অইছে হুনছি। পাশের গাঁয়ে অইছে। আমাগো গাঁয়ে অয় নাই। কিন্তু মানুষে ত থাকল না। আমাগো দক্‌খিনের পাড়া — বিজয় বসুগো পাড়া। আজ পাঁচটা মানুষ নাই। তাগোর ঘরদোর বেইচ্যা চইল্যা গেল। কতো জমিন মানুষে জোর দখল কইরা লইল। তহন ভাবছি, পাকিস্তান অইল, তয় মানুষ ভিটামাটি ছাড়া অইব ক্যান? (শওকত, ২০০১, ২ : ২৭৮-২৭৯)।

উপর্যুক্ত বর্ণনাংশে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস এবং তার অসংগতি উঁকি দিলেও তা বিস্তৃতির সুযোগ পায়নি। বর্তমানকে স্পষ্ট করার জন্য ঔপন্যাসিক উপর্যুক্ত ঘটনার উল্লেখমাত্র করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, *দুই সৈনিক* উপন্যাসের কাহিনির বড় কোনো লক্ষ্য নেই। এজন্য উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি অর্থাৎ আদি নেই, সম্মুখভূমি অর্থাৎ অন্ত নেই, কেবল মধ্যটুকু অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধটুকু আছে। তাও আবার সম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধ নেই, আছে

মুক্তিযুদ্ধের একটি বিশেষ দিক। এই দিকটি হচ্ছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চোখে বাঙালি সব সময় শত্রুর জাত। 'বাঙালিরা যতই মুসলিম লীগার হোক, যতই ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানের সমর্থক হোক, তারা যে বিদ্রোহীর জাত, আপন হতে পারে না, সে কথা মনে করেই হানাদার বাহিনীর সদস্যরা তৎকালীন স্বাধীনতার বিপক্ষচারী লোকদেরও ক্ষমা করেনি। অপরপক্ষে তারা ছিল কালসাপ। দুধকলা দিয়ে পুষলেও সর্প সুযোগ পেলে ছোবল মারবে' (অনীক ১৯৯৫ : ১৭২)। বস্তুত, এটি এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুও বটে। বিষয়বস্তুর এই ক্ষুদ্রতা উপন্যাসের কাহিনিকেও একমুখী এবং সংক্ষিপ্ত করেছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের পটভূমি, লক্ষ্য, গভীরতা, বিস্তার ইত্যাদির এইরূপ উচ্চাভিলাষহীনতা দেখে আক্ষেপ করেই হাসান আজিজুল হক বলেছেন—

> মুক্তিযুদ্ধের যে যা দেখেছেন লিখে ফেলেছেন, লক্ষ লক্ষ বুলেট নিক্ষেপ করেছেন কাগজে, ক্রাইম স্টোরি লেখার মতো করে কিন্তু সেই অসম্ভব কষ্টকর, নিদারুণ যন্ত্রণার পথটা দিয়ে এ পর্যন্ত কেউ যান নি। এই পথে আছে বাইশ বছরের ইতিহাস, বাইশ বছরের রাজনীতি, মানুষের ক্ষোভ হতাশা ক্রোধ আর বিদ্রোহ, আছে আট কোটি মানুষের তপ্ত রক্তের সর্বনাশা বন্যা, আছে কোটি কোটি মানুষের নিদারুণ দেশত্যাগের অপমান আর বর্ণনাতীত দুঃখ, আছে দাউদাউ করে পুড়ে যাওয়া, অগণিত মানুষের খেতখামার, বাড়িঘরের তপ্তচিহ্ন, লক্ষ লক্ষ নরহত্যার তাণ্ডব, লক্ষ লক্ষ বলাৎকারের পাপ আর আছে এক বিশাল ক্রোধের অগ্নি যা থেকে জন্ম হলো বাংলাদেশের। সেই মহৎ প্রাপ্তি আর বিশাল প্রবঞ্চনার ইতিহাস কেউ লেখেন নি (হাসান, ১৯৯৪ : ৩০)।

হাসান আজিজুল হকের উপর্যুক্ত বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত আছে *দুই সৈনিক* এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অপরাপর উপন্যাসের কাহিনির সরল-সংক্ষিপ্ত-একমুখী হওয়ার যাবতীয় রহস্য। তবে, শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে ভাবা জরুরি যে, তাঁর উপন্যাসগুলো তাৎক্ষণিকভাবে রচিত। এসব উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত জীবন্ত স্মৃতিকে রূপদান করা হয়েছে।

দুই সৈনিক উপন্যাসটি চরিত্রপ্রধান নয়, ঘটনাপ্রধান। ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনীর কর্মকাণ্ডের পাশবিক স্বরূপ প্রকাশই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের প্রশ্নে ঔপন্যাসিক নিরাসক্ত নন, বরং প্রবলভাবে আসক্ত। এ কারণে চরিত্রগুলো উপন্যাসের নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাত, বিপর্যয়-উত্থান, মানবিক-অমানবিক সংকট ইত্যাদি ব্যাপকভিত্তিক জীবনজালের বাস্তবতায় জারিত হয়ে ক্রমে হয়ে ওঠেনি। ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলোকে যেন আগে থেকে তাদের কর্তব্য ঠিক করে দিয়েছেন এবং চরিত্রগুলো একমাত্রিকভাবে সেই আচরণ করেছে। জীবন মানে প্রতিনিয়ত অভাবিত ঘটনার সম্মুখীন হওয়া। কিন্তু *দুই সৈনিক* উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র সে-রকম কোনো বাস্তবতার মুখোমুখি হয়নি। সাহেলী-চামেলী-মখদুম মৃধার নিকট হয়ত আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি কিছুটা অভাবিত ছিল। এ জন্য তারা বিস্মিত এবং স্তব্ধও হয়েছে। পাঠক কিন্তু আগে থেকেই বিষয়টি জানত। এই যে পাঠকের পূর্বধারণার আবৃত্তি, এটি উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে প্রথাগত এবং মীমাংসিত করে ফেলেছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অধিকাংশ

উপন্যাসের চরিত্রায়ণের এটি একটি দুর্বলতা বলে মনে হয়। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলাদেশের অধিকাংশ উপন্যাসের চরিত্রগুলো একারণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের টাইপ চরিত্রে পরিণত হয়েছে। *দুই সৈনিক* উপন্যাসের চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। এ উপন্যাসের দুই চরিত্র — মেজর হাকিম এবং ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ, সাহেলী, চামেলী, এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মখদুম মৃধা — তাদের শ্রেণিচরিত্রের বাইরে কোনো আচরণই করেনি। যার যা করার কথা বলে পাঠক আগে থেকে জানত, সে সেই আচরণই করেছে। তবে মখদুম মৃধা চরিত্রটি কিছুটা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। কারণ চরিত্রটির মধ্যে ট্রাজিক রসের সমাবেশ ঘটেছে। মখদুম মৃধা চরিত্রটি যেমন তার নিজের গ্রাম শাসন করে, তেমনি উপন্যাসকেও শাসন করেছে। তাকে ঔপন্যাসিক একমুখী চরিত্র হিসেবে না এঁকে, তার মধ্যে পরস্পর বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার করেছেন। সে একাধারে যেমন ঘোরতর মুসলিম লীগার, তেমনি সে আওয়ামী লীগারও বটে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় —

> একই সঙ্গে মৃধা দুই কুল রক্ষায় মন দিয়েছিল। পুরাতন মুসলিম লীগার ত আছেই। পুরাতন মহব্বৎ। দেশে জাতীয়তার বন্যা বইয়ে দিচ্ছে আওয়ামী লীগ। সেই ঢেউ উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই ভেতরে ভেতরে মৃধা স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীদের সমর্থন দিতে লাগল। একদম প্রকাশ্যে নয় — প্রকরণে। টাকা পয়সা চাঁদা-স্বরূপ দান।...স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীরা তাকে নির্বাচনের সময় দাঁড়ানোর জন্যে অনুরোধ করলে। কিন্তু মৃধা রাজি হল না। মুসলিম লীগের দাওয়াত তেমনি প্রত্যাখ্যান করলে, নিজের বয়স এবং অদক্ষতার দোহাই দিয়ে (শওকত ২০০১, ২ : ২৬৮)।

প্রকৃতপক্ষে, মখদুম মৃধাকে ঔপন্যাসিক নির্মাণ করেছেন এক বিষয়বিলাসী এবং পারিবারিক-সামাজিক নিরাপত্তাবিলাসী চরিত্র হিসেবে। মৃধার আদর্শ হচ্ছে 'যেদিকে বাতাস বয় সেদিকেই তুলে দাও পাল'। উপন্যাসের প্রথম থেকে নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত চরিত্রটির মধ্যে অস্তিত্বরক্ষার প্রবণতা বেশ প্রবল। অস্তিত্বরক্ষার খাতিরে সে যেকোনো কিছু করতে পারে। মূলত 'হুশিয়ার ব্যক্তি মখদুম মৃধা'। যখন মৃধা দেখেছে সেনাবাহিনীর তোষণ-পোষণই টিকে থাকার প্রধান উপায়, তখনই সে সেনাবাহিনীর আশ্রয়-ছায়ায় যাওয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে নিয়ে গিয়েছে বাড়িতে। কিন্তু এতে সে আরো নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। তার দুই মেয়ে সেনাবাহিনীর দুই অফিসার মেজর ফৈয়াজ এবং ক্যাপ্টেন হাকিম কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে। তখন মৃধার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। সৌভাগ্যের অন্বেষণে পরম দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে মখদুম মৃধা। ঠিক তখনই ঔপন্যাসিকের মখদুম মৃধা চরিত্র-নির্মাণের উদ্দেশ্য-আদর্শ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর উপন্যাসের রসনিষ্পত্তি এক নবতর পর্যায়ে উন্নীত হয়। উপন্যাসটি স্যাটায়ার থেকে স্যাড-এ পরিণত হয়। মৃধার আত্মহত্যার এই পরিণতির মধ্য দিয়ে উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে ধারণ করে থাকা কাহিনিও নিটোল রূপ লাভ করে। ফলে এক সাক্ষাৎকারে উপন্যাসের কাহিনি ও রসনিষ্পত্তি বিষয়ে শওকত ওসমানের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিও প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তব হয়ে ওঠে—

> দুই সৈনিকের মতো উপন্যাস সে-তো নিটোল উপন্যাস, একেবারে গ্রীক ট্রাজেডির মতো। ছোট বড় কথা নয় (সৌমিত্র ২০০৮ : ১৮)।

দুই সৈনিক উপন্যাসের ভাষা এর আঙ্গিককে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। ঔপন্যাসিক তাঁর ধারিত বক্তব্যকে উপস্থাপনের জন্য উপন্যাসের শুরু থেকেই ব্যঙ্গাত্মক রীতি বেছে নিয়েছেন। ব্যঙ্গাত্মক রীতি অবলম্বন করায় এর ভাষা শওকত ওসমানের অপরাপর উপন্যাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে উঠেছে। ভাষায় ব্যঙ্গের ছোঁয়া থাকায় কোনো কোনো চরিত্রও ব্যঙ্গাত্মক এবং লঘুচপল হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে নবম পরিচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত ভাষার তির্যক ভঙ্গির মাধ্যমে মখদুম মৃধার নিরাপত্তাবিলাসী মনোতলের বাস্তবতা যত নিখুঁতভাবে উন্মোচিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে চমৎকার। ভাষায় এই ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গির কারণে মখদুম মৃধা চরিত্রটিকে কখনো সিরিয়াস এবং ভয়ংকর মনে হয়নি। ফলে উপন্যাসের শেষে তার মৃত্যু করুণরসের উদ্রেক করেছে। মৃধার মৃত্যুই ঔপন্যাসিকের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। লক্ষণীয় যে, ঔপন্যাসিক যখন উপন্যাসের শেষাংশের Sadness-এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তখন ভাষার মধ্য থেকে স্যাটায়ার (Satire) লোপ পেয়েছে। যেমন—

> হঠাৎ দৌড় থামালে মৃধা। স্তব্ধ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ মা-মা রবে অন্দরের প্রাঙ্গণে দৌড়ে এসে থামল। এই মাতৃ-সম্বোধন বুড়িবিবির প্রতি সম্বোধন নয়। এই আর্তরব সেই অদৃশ্য চিরবিরাজমান স্নেহময়ীর কাছে আবেদন — যিনি সকল বেদনা যন্ত্রণা নিমেষে হরণ করে নিতে সক্ষম, যার বুকের কাছে গেলে সকল দাহ নিভে যায় (শওকত ২০০১, ২ : ৩২৫)।

উদ্ধৃতাংশের ভাষা অন্তর্গত বেদনার মতোই গভীরতলশায়ী, কিছুটা নিথর এবং তৎসম শব্দবহুল, ধীরগতিসম্পন্ন। Sad-কে ধারণ করার উপযোগী এই ভাষাভঙ্গি উপন্যাসের কাহিনির শেষাংশকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং শিল্পসফল করে তুলেছে। আবার বিষয়ের চাপল্যে অথবা উপস্থাপনার চটুল ভঙ্গির কারণে উপন্যাসের প্রথমাংশের ভাষা হয়ে উঠেছে নির্ভার; কাহিনির গতিশীলতাকেও করেছে ত্বরান্বিত। যেমন—

> আল্লাতালা আইয়ুব খান এবং তার বংশধরদের অমর করুক। আর যদি কেউ অকালে মরে, তার ভেস্ত নসিব হোক। সেই ছিল প্রেসিডেন্টের মত প্রেসিডেন্ট। অবহেলিত গ্রামাঞ্চলের দিকে তার মত আর কেউ নজর দেয় নি।...কবি জসীমউদ্‌দীন বহুৎলম্বা শ্বাস ফেলতে পারেন, কিন্তু আইয়ুব খান হচ্ছেন সত্যিকার দরদী।...কিন্তু বেঈমানস্য বেঈমান বাঙালি জাত। হঠাৎ খেপে উঠল (শওকত, ২০০১, ২ : ২৬৮)।

মৌলিক গণতন্ত্রী মখদুম মৃধার স্বগতোক্তি হলেও উদ্ধৃতাংশের ভাষায় তির্যকভঙ্গি এবং অতিরেকের সমাবেশের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকও ব্যঙ্গের ছুরিসহ হাজির থেকেছেন। ভাষা এবং তার ভঙ্গির এই ব্যঙ্গাত্মক তির্যকতা উপন্যাসের সংলাপ ও বিবরণকে শুধু স্রোতগ এবং নির্ভারই করেনি, চরিত্রায়ণ থেকে শুরু করে দৃষ্টিকোণ, পরিচর্যা ইত্যাদির উপরও এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

দুই সৈনিক উপন্যাসটি ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। ঔপন্যাসিকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি বিভিন্ন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক তাঁর বক্তব্য বিষয়ের উপর আলো ফেলেছেন। কখনো কখনো এক চরিত্রের দৃষ্টিকোণে অন্য

চরিত্রকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে চরিত্রায়ণ এবং কাহিনি সম্পন্ন ও অগ্রসর হয়েছে। যেমন, চামেলী এবং সাহেলীর একটি কথোপকথন, যেখানে ঔপন্যাসিক তাদের দুজনের দৃষ্টিকোণ থেকে মখদুম মৃধাকে দেখার চেষ্টা করেছেন, যেটি মূলত ঔপন্যাসিকেরই দৃষ্টিকোণ। চামেলী-সাহেলী যেন লেন্স হিসেবে ব্যবহৃত—

> রোজ অত্যাচারের কাহিনি শুনছি; আমার (সাহেলীর) ত ঘুম হয় না। বাপজান (মখদুম) বলে, সব প্রপাগাণ্ডা। ইন্ডিয়ার কারসাজি।...চামেলী এবার গম্ভীর হয়ে যায় এবং বলে, "বাপজান এক মানুষ বটে। হাজি মানুষ। এত অত্যাচার চলেছে, কিন্তু মুখে অহো-শব্দ পর্যন্ত নেই। শুধুই এক কথা : আল্লার দান পাকিস্তান। তাকে যত কাফের কম্যুনিস্ট আর আওয়ামী লীগ মিলে ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তার সাথে যোগ দিয়েছে বিধর্মী হিন্দুস্তান (শওকত, ২০০১, ২ : ২৭৬)।

উদ্ধৃতাংশে চামেলী ও সাহেলীর দৃষ্টিকোণে মৃধা ব্যাখ্যাত হয়েছে, একই সঙ্গে চামেলী-সাহেলীর মনোতলের চারিত্র্যও স্পষ্ট হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক দৃষ্টিকোণ এবং ঔপন্যাসিকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণে উপন্যাসটির বক্তব্য বিষয় আলোকিত হয়েছে। এছাড়া মাঝে মাঝে দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনি গতিশীল হয়ে পরিণতিসঞ্চারী হয়েছে। *দুই সৈনিক* উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে এক বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে মখদুম মৃধার যাবতীয় বয়ানে এবং বক্তব্যের মধ্যে পাকিস্তানবাদী মুসলিম লীগবাদী মানসিকতা ফুটে উঠেছে—অন্তত গাঁয়ে গাঁয়ে মিলিটারি আসার পর থেকে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এসব বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য ঔপন্যাসিক ব্যঙ্গাত্মক রীতি অবলম্বন করেছেন। এই ব্যঙ্গের কারণে মৃধার যাবতীয় পাকিস্তানবাদী বক্তব্য এবং আচরণের মধ্যে অন্তঃসলিল ধারার মতো ঔপন্যাসিকের পাকিস্তানবিরোধী একটি দৃষ্টিকোণ সব সময় ক্রিয়াশীল থেকেছে। ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনরীতিই উপন্যাসের এই বিশেষ ধরনের দৃষ্টিকোণ ব্যবহারকে সম্ভব করে তুলেছে।

দুই সৈনিক উপন্যাসে পরিচর্যার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, অধিকাংশ স্থানে চিত্রাত্মক এবং নাটকীয় পরিচর্যা ব্যবহৃত হয়েছে। চিত্রাত্মক পরিচর্যার মধ্যে আবার কোথাও কোথাও চলচ্চিত্রের দৃশ্যপরিকল্পনার ছাপ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। যেমন—

> ফুরফুরে হাওয়া বয়ে আসছে কতো দূর থেকে। সামনে হিজলতলীর মাঠের বুকের উপর জেলাবোর্ডের পীচঢালা কালো রাস্তাটা চোখকে টেনে টেনে নিয়ে যায়, তারপর এক সময় আছড়ে ফেলে দেয় যেন আর কিছুই দৃষ্টির মধ্যে না থাকে। তখন হঠাৎ ভেসে ভেসে ওঠে বনজ নানা শ্যামলিমা। বোঝা যায়, অনেক অনেক গ্রামে অস্তিত্বের ছায়া ফেলছে আবছা রঙে রঙে (প্রাগুক্ত : ২৬৭)।

উদ্ধৃতাংশে যেন একটি সচল ক্যামেরা ক্রমাগতভাবে একটি বড় দৃশ্যপট বা চিত্রকে উন্মোচিত করেছে। তবে উপন্যাসে নাটকীয় পরিচর্যাই বেশি লক্ষ করা যায়: কখনো স্বগতোক্তি, কখনো সংলাপের বহুল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর বক্তব্য-বিষয়, দৃষ্টিকোণ, চরিত্রায়ণের কাজটি করেছেন।

তিন

নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩) উপন্যাসের বিষয় মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক বাস্তবতা এ উপন্যাসের অন্বিষ্ট নয়। শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস-চতুষ্টয়ের একেকটি উপন্যাস মুক্তিযুদ্ধের একেকটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করেছে। *নেকড়ে অরণ্য* উপন্যাসের বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধকালীন পাক-সেনাদের নারী নির্যাতনের বীভৎসতা। বাঙালি জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা যে কেবল রক্ত এবং সম্পদের বিনিময়ে এসেছে তা নয়, এর জন্য সম্ভ্রমও খোয়াতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ নারীর। নারীর এই নিরুপায় আত্মত্যাগের করুণ বাস্তবতার আলেখ্য হচ্ছে *নেকড়ে অরণ্য* উপন্যাস। উপন্যাসটির নামকরণের মধ্যে *জাহান্নম হইতে বিদায়* উপন্যাসের মানসগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত পূর্ববাংলাকে ঔপন্যাসিক 'জাহান্নম' বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন। ঠিক একইভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত বাংলাকে তিনি 'নেকড়ে অরণ্য' বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন। যে অরণ্যে নেকড়ের মতো মাংসাশী প্রাণীর বিচরণ তা-ই নেকড়ে অরণ্য। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সমগ্র বাংলাদেশই নেকড়ে অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু শওকত ওসমান সেই সমগ্র বাংলার আরণ্যিক বাস্তবতার বিবরণে না গিয়ে, একটি প্রতীকী অরণ্যের পরিচয়কে শিল্পিত করেছেন। 'যে যন্ত্রণার বিনিময়ে স্বাধীনতা পাওয়া গিয়েছে তাকে এবং স্বাধীনতাকে একত্রিত করে মনের মধ্যে রাখা হয়েছে এই বইটিতে' (রণেশ ১৯৭৩)।

উপন্যাসের কাহিনির মূল সময় পরিসর মোটামুটি তিন মাস। কিন্তু এর কাল পরিসর শুধু তিন মাসের মধ্যে সব সময় সীমাবদ্ধ থাকেনি। মূল পাঁচটি চরিত্রের 'স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যত' মিলিয়ে উপন্যাসের কালের পরিধি আরো বিস্তৃত হয়েছে। ফলে কাহিনিও সময়ের পরিধির মতো ক্রমে বিস্তারিত হয়েছে। মূল কাহিনির সঙ্গে মূল পাঁচটি চরিত্রের অধিকাংশের অতীত-স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনার গল্প যুক্ত হয়ে উপন্যাসটির কাহিনির পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। তবে উল্লেখ্য যে, এসব চরিত্রের ব্যক্তিগত কাহিনিগুলো অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব্যক্তিগত নয়। কারো কারো কাহিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধেরই কাহিনি। অর্থাৎ কীভাবে সংশ্লিষ্ট চরিত্রটি বাস্তুচ্যুত এবং স্বামী-সন্তান-সংসারচ্যুত হয়ে এই অন্ধকার কুঠুরিতে এসেছে তারই কাহিনি বিধৃত হয়েছে কারো কারো কাহিনিতে। যেমন— পঞ্চম পরিচ্ছেদব্যাপী রশীদা বিবির সংসারের সুখ-দুঃখের খুঁটিনাটি অতীত বর্ণিত হয়েছে। এই উপকাহিনিতে একটি ধারাবাহিক সংসারযাত্রার বর্ণনা আছে। এই ধারাবাহিক সংসারযাত্রায়-যে হঠাৎ ছেদ ঘটিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ সেকথাও বর্ণিত হয়েছে উপকাহিনিটিতে। ফলে উপন্যাসের পাঁচটি নারীচরিত্রের উপকাহিনিগুলো অনিবার্যভাবে মূল কাহিনির উপর এসে সবেগে আছড়ে পড়ে এক পূর্ণাঙ্গ এবং মর্মন্তুদ কাহিনিবৃত্ত রচনা করেছে। আবার, কোথাও কোথাও কোনো কোনো চরিত্রের বর্তমান লক্ষ্যহীন কক্ষপথের বীভৎসতা এবং ট্রাজেডিকে আরো বেশি হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য ওই চরিত্রের বয়ানে অতীতের ব্যক্তিগত উপকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। যেমন, কুমারী সখিনার প্রেমানুভূতির কাহিনি (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এভাবে *নেকড়ে অরণ্য* উপন্যাসের কাহিনি নানা উৎস থেকে উপকাহিনিকে আত্মসাৎ করে পূর্ণাঙ্গ এবং স্বরাট কাহিনিবৃত্ত রচনা করেছে। ঔপন্যাসিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপন্যাসটির কাহিনির বুননকর্ম সম্পন্ন করেছেন।

উপন্যাসটি সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। ঔপন্যাসিক উপন্যাসটিতে নিজেই বর্ণনাকারী এবং তদারককারী। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছামাফিকই চরিত্রগুলো তাদের নিজেদের স্বরূপে মেলে ধরেছে। ঔপন্যাসিক অদৃশ্য আড়াল থেকে যেন চরিত্রগুলোকে নিজ কাজে ব্যবহার করেছেন। তবে কোথাও কোথাও ঔপন্যাসিক ঘটনাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এবং বর্ণনা করার জন্য, কোনো কোনো চরিত্রকে ব্যবহার করেছেন *নেকড়ে অরণ্য* উপন্যাসে। তখন ওই সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারী চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসের অগ্রগতি এবং বর্ণনা সাধিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের মনঃকথা এসব পর্যায়ে চরিত্রগুলোই বলেছে। এতে উপন্যাসের কাহিনিতে নতুন প্রাণ ও স্বাদের সঞ্চার হয় এবং কাহিনিতে গতিশীলতা আসে। যেমন, তৃতীয় এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদের কাহিনির প্রায় পুরো অংশই যথাক্রমে সখিনা এবং রশিদাবিবিরি বয়ানে এবং দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। দৃষ্টিকোণ এবং বর্ণনাকারীর এই স্থানান্তর উপন্যাসটির কাহিনিকে সমৃদ্ধ এবং গতিশীল করেছে। তবে উপন্যাসে যাদের দৃষ্টিকোণ এবং বর্ণনা ব্যবহৃত হয়েছে তারা সবাই যেহেতু উপন্যাসে একই অবস্থা যাপন করেছে, সেহেতু তাদের দেখার, অনুভবের এবং প্রকাশের ধরনটি প্রায় একই রকম হয়েছে। উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে নতুন কোনো বোধবোধির সঞ্চার করেনি।

নেকড়ে অরণ্য উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য উপন্যাসের মতোই চরিত্রায়ণের বিশেষ প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় না। চরিত্রগুলো প্রতীকী তাৎপর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। প্রতীক হিসেবে যখন উপন্যাসে কোনো চরিত্র উপস্থাপিত হয়, তখন তার বিকাশ-প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হয় না; অথবা বলা যায়, এসব ক্ষেত্রে চরিত্রের বিকাশ-প্রকাশের পথ অনেকটা রুদ্ধ হয়ে যায়। *নেকড়ে অরণ্য* উপন্যাসের চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে এ কথাটি প্রযোজ্য। তনিমা, সখিনা, রশীদা বিবি, আমোদিনী, জায়েদা প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধকালীন লাখো নির্যাতিত নারীর প্রতীক মাত্র। তারা এখানে ব্যক্তি নয়, সমষ্টির প্রতিনিধি মাত্র। এ কারণে তাদের তেমন কোনো ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায় না। এদিক লক্ষ রেখে নাজমা জেসমিন চৌধুরী বলেছেন—

> 'নেকড়ে অরণ্য'কে উপন্যাস বলা চলে না। কারণ এর মধ্যে চরিত্রসমূহের বিকাশ নেই, এই গ্রন্থ একটি ডায়েরী বা স্মৃতিচিত্র; মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন একটি বিশেষ দিকের উদ্‌ঘাটন হয়েছে এই গ্রন্থে, কিন্তু 'নেকড়ে অরণ্য'তে মুক্তিও নেই যুদ্ধও নেই (নাজমা, ১৯৮০ : ৪১২)।

কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক পরিচয়কে ফ্রেমবদ্ধ করা এ উপন্যাসের লক্ষ্য নয়। মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতীয় জীবনের নানা গ্রন্থি নিয়ে রচিত হলে, সেই বিশাল পরিসরে ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশ-প্রকাশ, উত্থান-পতন, অগ্রগতি-পশ্চাদ্ধাবন ইত্যাদির সম্ভাবনাও সেখানে তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু *নেকড়ে অরণ্য* উপন্যাসের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তা না থাকায় চরিত্রের বিকাশের প্রশ্নটি এখানে অবান্তর হয়ে গিয়েছে।

নেকড়ে অরণ্য উপন্যাসের ভাষা এর আঙ্গিককে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এ উপন্যাসের ভাষায় শওকত ওসমানের অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের ভাষার মতোই কাব্যিকতা কম। ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে একটি ক্রূর বাস্তবতাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। যে-বাস্তবতা আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধিকে স্তব্ধ করে দেয়, যে-বাস্তবতা আমাদের মধ্যে বিপন্ন-

বিস্ময় উৎপাদন করে, আমাদের স্থাণু করে দেয়। ফলে ঔপন্যাসিক এই বাস্তবতাকে উপস্থাপনের জন্য কোনো প্রকার কাব্যের জাল বোনার চেষ্টা করেননি। এ-উপন্যাসের ভাষা অনেকটা তথ্যনির্ভরতার কারণে নিরাবেগ। বাক্য কাটা কাটা। একটি নির্দিষ্ট গুদামঘরের ভেতরের পরিস্থিতিকে তিনি চিত্ররূপ দিতে চেয়েছেন। ক্যামেরা যেমন যা আছে তাকেই অতিরিক্ত রঙ-চঙ ছাড়া ফ্রেমবন্দি করে, তেমনি এর ভাষা ক্যামেরার কাজের বিকল্প হয়ে ওঠার কারণে স্থিরতা দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। ভাষার মধ্যেকার এই যথাস্থিতবাদী নিরাবেগের কারণে উপন্যাসের পরিচর্যা হিসেবেও চর্চিত হয়েছে চিত্রাত্মক রীতি। কোথাও কোথাও অবলম্বিত হয়েছে নাটকীয় পরিচর্যারীতি। তবে কোথাও কোথাও এর ভাষা চরিত্রের মনোতলের গভীর বাস্তবতাকে অনুকরণ করতে গিয়ে হয়ে উঠেছে অস্থির। চেতনাপ্রবাহের মতো গতিময় এবং উল্লম্ফনাক্রান্ত—

> আর কখনো যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং আমি জানতে পারি, তুমি তোমার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে রাইফেল ধরনি, মর্টার ছোড়নি,...আমি তোমাকে তখন খারিজ করে দেব আমার বুক থেকে। তোমার লম্ফঝম্ফ শুধু আমার কাছে। তুমি ভীরু...। পঁচিশে মার্চের ব্যবধান সব ভেঙে দিয়েছে নাকি? ঢাকা থেকে কুমিল্লা কত দূর? তিন হপ্তা আমি কুমিল্লার আশেপাশে থেকে গেলাম, তুমি এলে না।...আমার আব্বা কোথায় কী হয়ে গেল...আমি কেন এখানে?...আমি মালেগনিমাৎ ... আরবদেশে ইসলামের যুদ্ধের পর মাল ভাগ হত। যুদ্ধবন্দিনীরাও মাল (শওকত ২০০২, ৩ : ২৭)।

এছাড়া উপন্যাসটি একটিমাত্র সেটে উপস্থাপিত হওয়ায় বাহ্যিক বর্ণনার চেয়ে পারস্পরিক কথোপকথন বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। সংলাপের প্রাচুর্য উপন্যাসটিকে নাট্যিক গুণে গুণান্বিত করেছে। ফলে সংগত কারণেই নাটকীয় পরিচর্যা উপন্যাসের ভাষা এবং এর বিন্যাসকে বিশেষত্বমণ্ডিত করেছে।

চার

জলাংগী (১৯৭৪) শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সর্বশেষ উপন্যাস। উপন্যাসটির উদ্দেশ্য তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য উপন্যাসের মতোই। পাক-হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের বাস্তবচিত্র উন্মোচনই এ উপন্যাসের উদ্দেশ্য এবং বিষয়। এই উদ্দেশ্য ও বিষয়ের অভ্যন্তরে যে বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে তা হচ্ছে বাঙালির অকুতোভয় মানসিকতার চিত্রায়ণ — যা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্ফুরিত হয়েছিল। দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য, ন্যায্য অধিকারের জন্য বাঙালির সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের মহিমা 'জলাংগী' উপন্যাসটিকে মহিমান্বিত করেছে। স্বল্পায়তনের উপন্যাসটিতে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের সার্বিক টানাপোড়েনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাস্তবতা শিল্পিত না হলেও এর 'ভেতর সমুদ্র নিনাদের মত অভিনিবেশ লক্ষণীয়' (অনীক ১৯৯৫ : ১৮৩)।

শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য অধিকাংশ উপন্যাসের মতোই *জলাংগী* উপন্যাসের কাহিনিও সরল এবং একরৈখিক। উপন্যাসটির আদ্যন্ত পরিণামসঞ্চারী। একটিমাত্র কাহিনি জৈবিক ঐক্যে নিটোল মূর্তিতে গঠিত। একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রকে কেন্দ্রে

রেখে এর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। জামিরালি সেই কেন্দ্রীয় চরিত্র। তবে চরিত্রটির বহুমাত্রিক রূপ-রূপান্তর নেই। চরিত্রটি কেবল যেন সরলভাবে ঘটনার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিয়েছে। এই দুই প্রান্তের আবার দূরত্ব বেশি নয়। যোদ্ধা থেকে আত্মাহুতি — এই তার রূপান্তর। মূলত জামিরালি চরিত্রের চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক নানা ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন। নানা ঘটনার মধ্যে ঔপন্যাসিক চরিত্রটিকে রূপ দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। এক একটি ঘটনার মধ্যে ঔপন্যাসিক চরিত্রটিকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছেন। এই বিচারে *জলাংগী* চরিত্রপ্রধান নয়, ঘটনাপ্রধান উপন্যাস। ঘটনা এ-উপন্যাসে শুধু চরিত্রকেই নয়, উপন্যাসের গতিপ্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে।

জলাংগী উপন্যাসের ভাষা উপন্যাসটির আঙ্গিককে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। উপন্যাসটির ভাষা অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। এ উপন্যাসের ভাষায় নেই *দুই সৈনিক* উপন্যাসের ভাষার মতো ব্যঙ্গবাণ, নেই *নেকড়ে অরণ্যে*-এর মতো উচ্চস্বর এবং তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়ার ঝাঁঝ। আবার *জাহান্নম হইতে বিদায়* উপন্যাসের ভাষার মতো এ-উপন্যাসের ভাষায় কেন্দ্রীয় চরিত্রের অস্থির এবং সন্ত্রস্ত মনোলোকের ছায়াপাতও ঘটেনি। বরং এ-উপন্যাসের ভাষায় যেন ঔপন্যাসিক অনেকটাই শৈল্পিক নিরাসক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক তাঁর বিবরণের ভাষায় নিজের ব্যক্তিগত পক্ষপাতমূলক অশৈল্পিক অনুপ্রবেশ থেকে অনেকটাই দূরে থাকতে পেরেছেন। এ-উপন্যাসের ভাষার মধ্যে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত ক্রোধ, উত্তেজনা ইত্যাদির ছোঁয়াচ কম। ফলে, ভাষা বর্ণনাত্মক রূপ লাভ করেছে। ভাষার এই বর্ণনাত্মক নিরাসক্ত রূপের কারণে ঔপন্যাসিকের বর্ণিতব্য বিষয় বা ঘটনার ওপর অতিরিক্ত কাব্যত্ব অথবা চড়ারঙের সমাবেশ ঘটেনি। নিজের পোড়াবাড়িতে আসার পর এবং পিতার মৃত্যুসংবাদ শোনার পর জামিরালি এবং তার জ্ঞাতি নাসির মুন্‌শীর একটি কথোপকথন লক্ষ করা যাক—

> নাসির মুন্‌শী একসময় হাঁফ-ফুকার কেঁদে উঠল, 'বা-জান বুড়া বয়সে এসব দ্যাহনের লাইগ্যা পাকিস্তান হৈছিল? তোমার বা-জান...।' বৃদ্ধ তখন জামিরালির গলা জড়িয়ে ধরে আর ছাড়তে চায় না। কিন্তু জামিরালির চোখ মরুভূমি। স্তব্ধ দাঁড়িয়ে দুই হাত বৃদ্ধের গলায় রেখে বলল, 'কাঁদেন না, চাচা। কাঁদার সময় না। অহন দা'দ (প্রতিশোধ) নেওয়ার সময়' (শওকত ২০০২, ৩ : ৭৯)।

সর্বস্ব হারানো একটি মুহূর্তে, দুটি চরিত্রের ভাষায় পাকিস্তান এবং তার নির্যাতনের প্রশ্নে যে সংযম লক্ষ করা যায়, তা শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য উপন্যাসে বিরল। অন্যান্য উপন্যাসের ভাষা উত্তেজনা এবং প্রতিক্রিয়ার চাপে অনেকটাই অস্থির এবং অসংযমী। নিচুস্বরগ্রামের কারণে উদ্ধৃতাংশের এবং *জলাংগী* উপন্যাসের সার্বিক ভাষা পরিস্থিতির গভীরতা এবং ব্যাপকতাকে ব্যঞ্জিত করে তুলেছে যথার্থভাবে। *জলাংগী* উপন্যাসের ভাষাভঙ্গিকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। উপন্যাসের প্রথমাংশের ভাষাভঙ্গি সংগত কারণেই এক রকম এবং পরের অংশে অন্য রকম। প্রথমাংশে অর্থাৎ প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে জামিরালির গ্রামে প্রত্যাবর্তন, দেশের পরিস্থিতি নিয়ে বাবা-মা-চাচা-প্রেমিকার সঙ্গে কথাবার্তা এবং উৎকণ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি মেঘনা নদীর সাথে জামিরালির এক ধরনের একাত্মতার চিত্র এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। যে-মেঘনায় জামিরালিকে আত্মাহুতি দিতে

হবে, সেই মেঘনার সঙ্গেই তার এক জৈবিক এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছেন ঔপন্যাসিক উপন্যাসের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে। ফলে, এ-পর্বের ভাষা হয়েছে সংগত কারণেই অনুভববেদ্য, মনোধর্মী এবং বিস্তৃত-বিবরণধর্মী। যেমন—

> স্বভাবতই একটা মমত্ববোধ আছে তার (জামিরালি) এখানকার গাছপালা, জলাজাঙ্গালের প্রতি। আর মেঘনা নদীর আকর্ষণ তার কাছে কত প্রবল তা নিজেই পরিমাপ দিতে পারবে না। গ্রামের বাঁধের উপর দাঁড়ালেই দেখা যায়, জলের হাতছানি।... মেঘনার আহ্বান যেন জামিরের কানে কানে। রাত্রে বান ডেকে যখন জোয়ার আসে, তার বিপুল কলকলধ্বনি কতদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে জামিরালি শুনেছে এবং পুলকিত হয়েছে। (শওকত ২০০২, ৩ : ৬৬)

উদ্ধৃতাংশের ভাষা কেবল বিবরণধর্মী এবং মনোধর্মীই নয়, উপন্যাসের শেষাংশে জামিরালির ট্রাজিক পরিণতির ইঙ্গিত হিসেবেও শৈল্পিক ঐক্যে বিভূষিত। অন্যদিকে, উপন্যাসের বাকি ছয়টি পরিচ্ছেদের ভাষায় বিবরণের চেয়ে সংলাপ এবং ঘটনার ঘনঘটা বেশি। ঘটনার দিকে ঔপন্যাসিকের অধিক মনোযোগ উপন্যাসের ভাষাকে দ্রুতগামী এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমুখী করেছে। ফলে উপন্যাসের ভাষা এবং কাহিনির গতিপ্রকৃতি এক অপূর্ব সমন্বয় লাভ করেছে।

জলাংগী উপন্যাসের ভাষার এই দ্বৈততা উপন্যাসটির পরিচর্যার ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছে। অথবা বলা যায়, উপন্যাসের বিষয়ানুগ পরিচর্যা এর ভাষাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। উপন্যাসের প্রথম তিন পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক চিত্রাত্মক পরিচর্যার আশ্রয় নিয়েছেন। কোথাও কোথাও কাব্যিক পরিচর্যা দুর্লক্ষ্য নয়। আবার উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে মূলত নাট্যিক পরিচর্যার মাধ্যমে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক উপন্যাসটিকে পরিণাম-সঞ্চারী করেছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে উপন্যাসটি নাট্যিক উপাদানে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। সংলাপের প্রাধান্য, নাটকীয় দ্বন্দ্ব, নাট্যিক উৎকণ্ঠায় উপন্যাসের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট বাক্যে ঔপন্যাসিক পরিপার্শ্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণকে অনেকটা সিনেমাটিক কায়দায় উপস্থাপন করেছেন। একটি উদাহরণ—

> জামিরালি যে মাথা নিচু করেছিল আর তোলেনি। মেজরের সম্ভাষণ শেষে জনতার ভেতর একটা আলোড়ন পড়ল। কিন্তু সকলে চুপচাপ মুখ খুলে কেউ কিছু বললে না। হাজেরা ঘোমটার মধ্যে একবার ফুঁফিয়ে উঠেছিল মাত্র। মেজর হাশেম একটু বিব্রত বোধ করে। সে একবার মোসাহেব আলির দিকে এবং আবার জনতার দিকে তাকায়। সমস্ত জনতা যেন একটা অনড় স্তূপ (শওকত ২০০২, ৩ : ৯৩)।

উদ্ধৃতাংশে ছোট ছোট বাক্যে একটি বিচার সভার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এক একটি বাক্য এক একটি পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করেছে। সবগুলো পরিস্থিতি একত্র করলে তবেই একটি পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যে পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতি ফুটে উঠবে যেন। সিনেমার কাট টু কাট পদ্ধতিই এখানে অনুসৃত হয়েছে।

জলাংগী উপন্যাসটি ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক কখনো নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন আবার কোথাও কোথাও দৃষ্টিকোণের বদল ঘটেছে। কোথাও কোথাও কেন্দ্রীয় এবং প্রান্তিক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ

ব্যবহারের মাধ্যমে উপন্যাসের বিবরণ অগ্রসর হয়েছে। তবে উপন্যাস জুড়ে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণের একক আধিপত্য লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ স্থানে চোখ এবং মনটি চরিত্রের কিন্তু দৃষ্টিকোণটি ব্যবহৃত হয়েছে ঔপন্যাসিকের। অর্থাৎ চরিত্রের বক্তব্যকে ঔপন্যাসিক নিজের বর্ণনার বিষয় হিসেবে নিয়ে নিজেই সেখানে দৃষ্টিকোণের অধিকারী হয়ে উঠেছেন। যেমন, নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটিতে বিধৃত উপলব্ধির মালিক আপাতদৃষ্টিতে কাজেম মৃধা কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, দৃষ্টিকোণটি মূলত স্বয়ং ঔপন্যাসিকের—

> মৃধার চাপা ক্ষোভ ছিল মনে। চব্বিশ বছর আগে পাকিস্তান হওয়ার সময় সে (কাজেম মৃধা) কত কী আশা করেছিল। আরো স্বাচ্ছন্দ্য, নিশ্চিত জীবন। কিছুই সহজে মেলেনি। যেটুকু পেয়েছে স্রেফ গতরের জোরে। তার একটা বিহিত হওয়া দরকার (শওকত ২০০২,৩ : ৬৫)।

এভাবে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণের প্রবল প্রতাপে উপন্যাসটি কার্যকারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থেকে বক্তব্য বিষয়ের ঐক্য বজায় রেখে পরিণতিগামী হয়েছে।

উপন্যাসের আঙ্গিক যে একটি সময়ের ইতিহাসের চিহ্নকে ধারণ করে, শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিকের ইতিহাসে শওকত ওসমানের এ-এক বড় অবদান। তিনি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস চারটি রচনা করেছেন মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার চার বৎসরের মধ্যে। অস্তিত্ব-সংকট, প্রবল বিপন্নতার বোধ, তীব্র আবেগ ইত্যাদি ধারণ করায় উপন্যাসগুলোতে গভীর জীবন-দর্শনের প্রসঙ্গটি অবান্তর হয়ে পড়েছে। আবার তাৎক্ষণিকতার কারণে উপন্যাসগুলোর চরিত্রায়ণে, ভাষায়, পরিচর্যায়, বিবরণে যে দ্রুততা ও অস্থিরতা এসেছে তা-ই শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলোলোর আঙ্গিককে করে তুলেছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আঙ্গিকের এই বিশিষ্টতা কেবল উপন্যাসের শরীর গঠনের কৃৎ-কৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ঔপন্যাসিকের মনোতলের বাস্তবতাকেও প্রকাশ করেছে।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অনীক মাহমুদ (১৯৯৫)। *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*। ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী।

আহমদ ছফা (২০০৭)। 'একাত্তর : মহাসিন্ধুর কল্লোল'। *বেহাত বিপ্লব ১৯৭১, ১ম খণ্ড* [সম্পা. সলিমুল্লাহ খান], অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী (১৯৮০)। 'মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস'। *উত্তরাধিকার*, ৮ম বর্ষ, ৯ম-১০ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ফিরোজ আহমদ (১৯৯১)। 'শওকত ওসমানের জলাংগী : ট্রাজিক সেক্রিফাইস'। *নিসর্গ*, শওকত ওসমান সংখ্যা, (সরকার আশরাফ সম্পাদিত), বগুড়া।

যতীন সরকার (১৯৯১)। 'ইতিহাস চেতন শওকত ওসমান'। *নিসর্গ*, প্রাগুক্ত।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রণেশ দাশগুপ্ত (১৯৭৩)। 'নেকড়ে অরণ্য'। *সংবাদ*, ৯ সেপ্টেম্বর। ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৯)। *সাক্ষাৎকার*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০১)। *উপন্যাসসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০০২)। *উপন্যাসসমগ্র তৃতীয় খণ্ড*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

শহীদ ইকবাল (২০১০)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য*। অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

শিরিন আখতার (১৯৯৩)। *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সলিমুল্লাহ খান (২০০৭)। 'ছফাচন্দ্রিকা : বেহাত বিপ্লব ১৯৭১'। *বেহাত বিপ্লব : ১৯৭১, ১ম খণ্ড* (সম্পা. সলিমুল্লাহ খান], অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

সৌমিত্র শেখর (২০০৬)। *কথাশিল্পঅন্বেষণ*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

সৌমিত্র শেখর (২০০৮)। 'উপন্যাস নিয়ে শওকত ওসমানের মুখোমুখি'। *ব্যক্তি ও সাহিত্যিক শওকত ওসমান* (সম্পা. বুলবন ওসমান), দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

হাসান আজিজুল হক (১৯৯৪)। *কথাসাহিত্যের কথকতা*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

* প্রকাশকালের পরবর্তী সংখ্যা খণ্ডনির্দেশক।